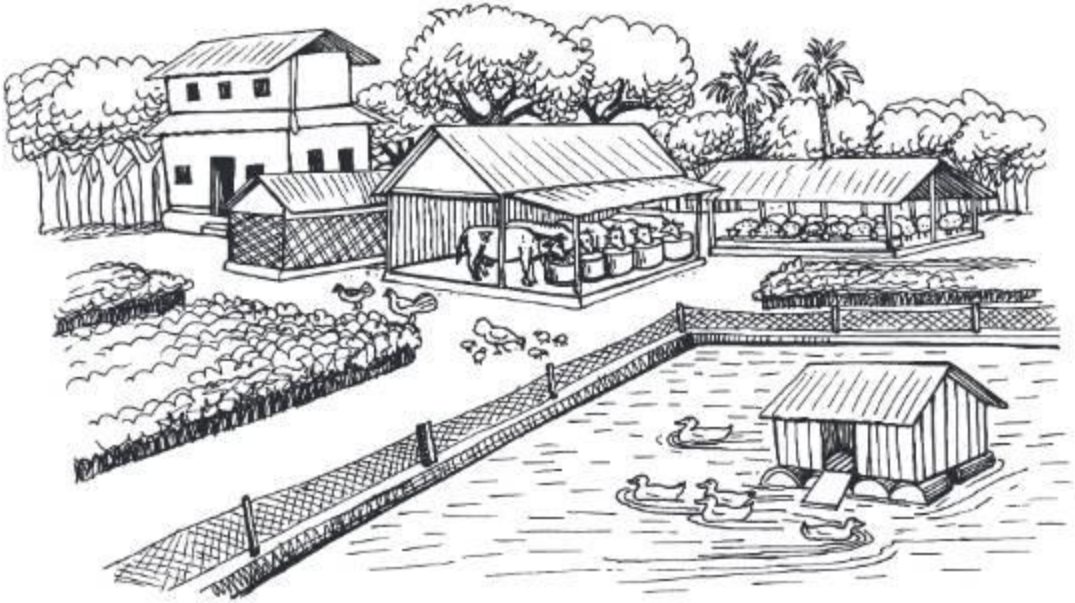


## সপ্তম অধ্যায়

### পারিবারিক খামার

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি এদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। এদেশের কৃষক প্রাচীনকাল থেকেই পারিবারিক কৃষি খামার পরিচালনা করে আসছে। এদেশের কৃষক তার খামারে শস্য, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য উৎপাদন করে। এ অধ্যায়ে পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পারিবারিক কৃষি খামার তৈরির কলাকৌশল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ক্ষুদ্র আয়ের উৎস হিসাবে পারিবারিক কৃষি খামারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পারিবারিক দুগ্ধ খামার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের বর্ণনা করতে পারব;
- দুগ্ধ দোহন ও সংরক্ষণের সনাতন ও আধুনিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- খামারের উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

## প্রথম পরিচ্ছেদ পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ও গুরুত্ব

### পারিবারিক খামার

বাংলাদেশের কৃষক পরিবার কৃষি খামারের মাধ্যমেই শস্য, শাকসবজি, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য উৎপাদন করে থাকে। আকার অনুযায়ী খামার বাণিজ্যিক ও পারিবারিক হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক কৃষি খামার আবার বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক খামারের জন্য বেশি পরিমাণ মূলধন ও লোকবল প্রয়োজন হয়। কিন্তু পারিবারিক খামারের জন্য কম মূলধন প্রয়োজন। পারিবারিক কৃষি খামার পরিবারের ভরণপোষণ মিটিয়ে কখনো কখনো কিছু অতিরিক্ত আয় করে থাকে। বর্তমানে কৃষক পারিবারিক কৃষি খামার থেকে আয় করার চিন্তা মাথায় রেখে খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। মূলত পরিবারের সদস্য দ্বারাই পারিবারিক কৃষি খামার পরিচালিত হয়।

### পারিবারিক কৃষি খামারের গুরুত্ব

- ১। পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটায়।
- ২। অতিথি আপ্যায়নে ভূমিকা রাখে।
- ৩। পরিবারের বেকার সদস্যদের কর্মক্ষেত্র তৈরি করে।
- ৪। পরিবারের সদস্যদের অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার হয়।
- ৫। পরিবারের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- ৬। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে কৃষি জমির উর্বরতা বাড়ানো যায়।
- ৭। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে আগাছা, ফসলের বর্জ্য ও উপজাতসমূহের সঠিক ব্যবহার করা যায়।
- ৮। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির মলমূত্র ব্যবহার করে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
- ৯। পরিকল্পিত পারিবারিক কৃষি খামার জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- ১০। কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।

### পারিবারিক শাকসবজি ও পোল্ট্রি খামার

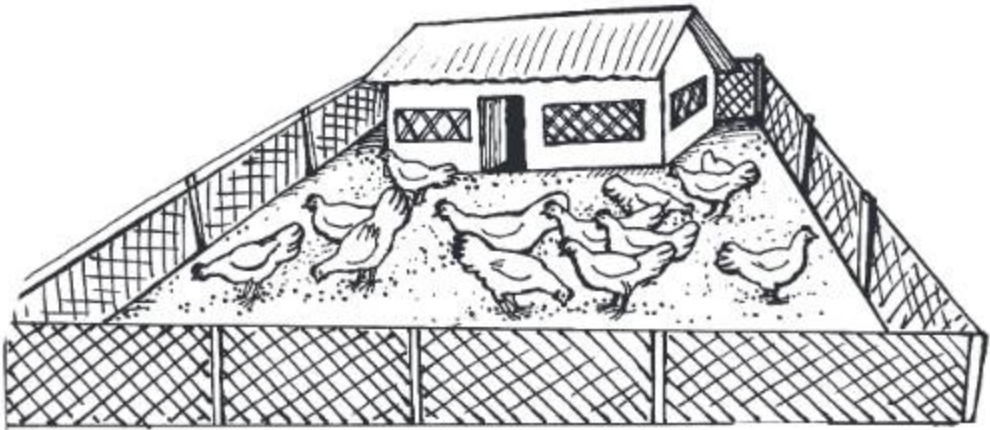
#### পারিবারিক শাকসবজি খামার

প্রধানত পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য এই খামার তৈরি হলেও পারিবারিক ক্ষুদ্র আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই খামারের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এই খামার বাড়ির

আশে পাশে খালি জায়গা, উঁচু ভিটা, মাঝারি নিচু জমিতেও করা যায়। অভিজ্ঞ কৃষকের পরামর্শ নিয়ে ঋতুভিত্তিক সারা বছরের চাষ পরিকল্পনা করলে প্রায় সারা বছরেই এই খামার থেকে ফসল পাওয়া যেতে পারে। যা তার পারিবারিক চাহিদা মেটানোর পরেও কিছু আয়ও করতে পারে। পারিবারিক নিবিড় পরিচর্যা আগাম ফসল উৎপাদন করতে পারলে উচ্চ বাজার মূল্য পাওয়া যেতে পারে। এখন সারা বছরই কোনো না কোনো শাকসবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। যা সবার চাহিদা মেটাতে পারে। রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক সার ব্যবহার না করেও ফসল উৎপাদন করা যায়। এতে শাকসবজি নিরাপদ ও সুস্বাদু হয়।

### পারিবারিক পোল্ট্রি খামার

পোল্ট্রি বলতে গৃহপালিত পাখি যেমন, হাঁস, মুরগি, কবুতর, তিতির, কোয়েল ইত্যাদিকে বোঝায়। তিতির ও কোয়েল আমাদের দেশের নিজস্ব পোল্ট্রি না হওয়ায় তেমন জনপ্রিয় নয়। এদেশের কৃষক পারিবারিক পোল্ট্রি খামারে হাঁস, মুরগি ও কবুতর পালন করে আসছে। গৃহপালিত পাখি পালন এ দেশের কৃষকের কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতীত কাল থেকে কৃষক তার খামারে দেশি জাতের হাঁস, মুরগি ও কবুতর পালন করে আসছে। সাধারণত কৃষক তার খামারে ৫-১৫টি হাঁস-মুরগি পালন করে থাকে। এই প্রচলিত খামারে কোনো উন্নত বাসস্থান বা খাদ্যের ব্যবস্থা থাকে না। হাঁস-মুরগি নিজেরা বাড়ির আশেপাশে চরে খাদ্যশস্য ও পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে। এতে পরিবারের ডিম ও মাংসের চাহিদা মেটে এবং উদ্বৃত্ত ডিম ও মুরগি বাজারে বিক্রি করে কিছু বাড়তি আয়ও হয়ে থাকে। এখানে বাণিজ্যিক বিষয়টি প্রাধান্য পায় না। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। দেশি জাতের হাঁস-মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদনক্ষমতা কম হওয়ার কারণে তারা পারিবারিক খামারে উন্নত জাতের হাঁস ও মুরগি পালন করে আসছে, যারা বছরে ২৫০টির মতো ডিম দেয়। এই পারিবারিক খামারে তারা অধিক মাংস উৎপাদনশীল ব্রয়লার মুরগিও পালন করে আসছে।



চিত্র : একটি পারিবারিক পোল্ট্রি খামার

এসব পারিবারিক খামারে ৫০- ৩০০টি পর্যন্ত উন্নত জাতের ব্রয়লার বা লেয়ার মুরগি বা হাঁস পালন করতে দেখা যায়। যেসব কৃষক জমির অভাবে শস্য, গরু, ছাগল ও মাছ চাষ করতে পারে না তারা সহজে পারিবারিক হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করতে পারে।



সফলভাবে পারিবারিক পোল্ট্রি খামার পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ থাকা উচিত। বিশেষ করে পোল্ট্রির জাত, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

### পোল্ট্রির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বলতে পোল্ট্রিকে সুস্থ রাখার জন্য রোগ প্রতিরোধ ও অসুস্থ পাখির চিকিৎসাকে বোঝায়। পোল্ট্রির ক্ষেত্রে চিকিৎসা থেকে রোগ প্রতিরোধই শ্রেয় - কথাটি অধিক প্রযোজ্য। কারণ কোনো পোল্ট্রি খামারে রোগ দেখা দিলে চিকিৎসা না করে কখনো ব্যবসা লাভজনক করা যায় না। তাই পারিবারিক পোল্ট্রি খামার পরিচালনার সময় নিম্ন লিখিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

- সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান বাচ্চা দ্বারা খামার শুরু করা।
- বন্যামুক্ত উঁচু স্থানে খামার করা ও খামারের আশপাশে পরিষ্কার রাখা।
- খামারের চারদিকে মাঝেমাঝে জীবাণুনাশক স্প্রে করা।
- খামারের পানি নামার জন্য নর্দমার ব্যবস্থা করা।
- সম্ভব হলে খামারের চারদিকে বেড়া দেওয়া।
- ঘরের মেঝে ও মুরগির লিটার শুকনা রাখা।
- পোল্ট্রির ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি করা।
- ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা।
- খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার রাখা।
- সুঘম খাবার ও বিপাক্য পানি সরবরাহ করা।
- হাঁস, লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির জন্য পৃথক পৃথক টিকাদান কর্মসূচি মেনে চলা।
- খামার কর্মীর শরীর ও পোশাক পরিচ্ছন্ন থাকা।

মহামারি আকারে রোগ দেখা দিলে সকল পাখিকে ধ্বংস করে মাটি চাপা দিতে হবে। রোগ নিরাময়ে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

### পারিবারিক গবাদি পশুর খামার

হাঁস-মুরগির মতো গবাদি পশু পালনও এদেশের পারিবারিক কৃষি খামারের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশে গৃহপালিত গবাদি পশুর মধ্যে গরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়া অন্যতম। বাংলাদেশের সর্বত্রই পারিবারিক খামারে গরু ও ছাগল দেখা যায়। কিন্তু মহিষ ও ভেড়া সর্বত্র দেখা যায় না। ধনী খামারির পক্ষে গরু ও মহিষ পালন করা সম্ভব। কিন্তু দরিদ্র ও ভূমিহীনদের জন্য ছাগল পালন করা সহজ। বাংলাদেশে পারিবারিকভাবে ছাগল পালন খুবই লাভজনক। কারণ ছাগলের মাংসের চাহিদা ব্যাপক থাকায় এর বাজারমূল্য অনেক বেশি। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দ্রুত প্রজননের উপযুক্ততা লাভ করে। এরা একসাথে ২-৩টি বাচ্চা প্রসব করে। পুরুষ ছাগল ৮ মাস বয়সে বাজারজাত করা যায়।

আমাদের দেশি গাভী দৈনিক ১.০-১.৫ লিটার দুধ দিয়ে থাকে। তাই পারিবারিক দুধ খামারে দেশি গরু দ্বারা পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানো, যায় কিন্তু কোনো বাড়তি আয় করা যায় না। আমাদের চাহিদার তুলনায় দুধের সরবরাহ খুব কম হওয়ায় পারিবারিক গরুর খামারে ক্ষতির আশঙ্কা নেই। হলস্টেইন, ফ্রিজিয়ান ও জার্সি জাতের সংকর গাভী দৈনিক ১৫-২০ লিটার পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশের পারিবারিক খামারগুলোতে এ ধরনের উন্নত জাতের সংকর গাভী পালন করা দরকার। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত যুবক উন্নত জাতের গাভীর পারিবারিক খামার করে সফলতা পেয়েছে। পারিবারিক খামারে গাভীর সংখ্যা ২-৫টি পর্যন্ত হয়ে থাকে। গাভীর সংখ্যা এর অধিক হলে তা বাণিজ্যিক খামারের রূপ নেয় এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য জনবল নিয়োগ করতে হয়।

সফলভাবে পারিবারিক পশু খামার পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ থাকা দরকার। বিশেষ করে পশুর জাত, উৎপাদনক্ষমতা, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

### গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বলতে পশু খামারের রোগ প্রতিরোধ ও অসুস্থ পশুকে চিকিৎসা প্রদান করাকে বোঝায়। পশুর চিকিৎসা থেকে রোগ প্রতিরোধের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ খামারে রোগ দেখা দিলে চিকিৎসা করে পশুকে উৎপাদনে আনতে অনেক সময় লাগে। তাই গবাদি পশুর খামার পরিচালনার সময় রোগ না হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

- উঁচু স্থানে খামার করা ও খামারের চারিদিক পরিষ্কার রাখা।
- খামারে সাধারণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
- খামারের আঙিনায় নিয়মিত জীবাণুনাশক স্প্রে করা।
- খামারের পানি নামার জন্য নর্দমার ব্যবস্থা করা।
- গোয়াল ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে তৈরি করা।
- খামারে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা।
- বন্য পশুপাখি খামারে ঢুকতে না দেওয়া।
- খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার রাখা।
- সুবম খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।
- পশুকে নিয়মিত গোসল করানো।
- গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার জন্য পৃথক পৃথক টিকাদান কর্মসূচি মেনে চলা।
- মৃত পশুকে মাটি চাপা দেওয়া।
- পশুর রোগে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।



চিত্র : গরুকে গোসল করানো হচ্ছে

কাজ : শিক্ষার্থীরা বেকোনো একটি খামার পরিদর্শন করবে এবং খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে।

### পারিবারিক মৎস্য খামার

#### পারিবারিক মৎস্য খামারের ধারণা ও গুরুত্ব

আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে অনেকের বাড়িতেই পুকুর আছে। এই পুকুরগুলো গৃহস্থালির কাজে পানির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এসব পুকুরে সাধারণত সনাতন পদ্ধতিতে কিছু মাছ চাষও করা হয়। যেমন- পোনা মাছের খাবার হিসাবে বাড়ির যে উদ্ভূত ভাত ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য থাকে তা দেওয়া হয়। ফলে এসব পুকুরে উৎপাদন অনেক কম। অথচ এসব পুকুরে পরিকল্পনামাফিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ চাষের আওতায় আনতে পারলে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই উৎপাদিত মাছ পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মিটিয়েও বাজারে বিক্রি করা যায়। আবার বাড়ির আঙিনায় বা পিছনে কিছুটা জায়গা থাকলে সহজেই একটি মিনি পুকুর খনন করা যায়। এবং এই মিনি পুকুরকেও পারিবারিক মৎস্য খামার হিসাবে গণ্য করে মাছ চাষ করা যায়। এসব পারিবারিক মৎস্য খামারগুলো বাড়ির মহিলাদের দ্বারাও পরিচালনা করা সম্ভব। মহিলারা এসব কাজ করার ফাঁকে কিছুটা সময় পুকুরে মাছ চাষের জন্য ব্যয় করলে একদিকে যেমন সহজেই পারিবারিক আয়িষের চাহিদা পূরণ হবে অন্যদিকে সংসারে বাড়তি আয়ও সম্ভব হবে। আবার পারিবারিক মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবারের বেকার সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

#### পারিবারিক খামারে চাষ উপযোগী মাছ

নিচে পারিবারিক খামারে চাষ করা যায় এরকম অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন কয়েকটি মাছের বর্ণনা দেওয়া হলো -

##### ক) দেশি মাছ

চাষযোগ্য দেশি মাছের প্রজাতির মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউশ চাষের জন্য খুব উপযোগী। দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র এ মাছগুলো পাওয়া যায়। তবে খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-দিঘিসহ বদ্ধ পানিতে এরা ডিম পাড়ে না। বর্ষাকালে (মে-জুলাই) এ সকল মাছ স্রোতযুক্ত নদীর কম গভীর অংশে ডিম ছাড়ে। প্রণোদিত বা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারিতে এদের পোনা উৎপাদন করা যায়। চাষকালীন সময়ে এ সব মাছ সম্পূর্ণরূপে খাদ্য হিসাবে ফিশমিল, খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি গ্রহণ করে। পর্যাপ্ত খাবার পেলে কাতলা মাছ বছরে ২-৩ কেজি পর্যন্ত হয়। রুই ও মৃগেল মাছ বছরে ১ কেজি ওজনের হতে পারে। দুই বছর বয়সে এ সকল মাছ ডিম পাড়ার উপযুক্ত হয়।

##### খ) বিদেশি মাছ

আমাদের দেশের পরিবেশে সহজে খাপ খায়, দ্রুত বাড়ে ও হ্যাচারিতে সহজে পোনা তৈরি করা যায় এমন কিছু বিদেশি মাছ চাষের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে আনা হয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মাছ হচ্ছে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কার্পিও, থাইসরপুটি, তেলাপিয়া বা নাইলোটিকা ও থাইপাঙ্গাশ। এসব মাছ দেশি কার্পজাতীয় মাছের সাথে সহজেই মিশ্র চাষ করা যায়।





সিলভার কার্প



গ্রাসকার্প



কার্পিও



নাইলোটিকা



সরপুটি

চিত্র : চাষযোগ্য কয়েকটি বিদেশি মাছ

### খামার পরিচালনার বিভিন্ন ধাপ

অনেকগুলো ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খামার পরিচালনা করা হয়। খামার পরিচালনার বিভিন্ন ধাপগুলো হচ্ছে -

ক) খামারে পোনা মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা (পুকুর প্রস্তুতি) : পুকুরের আগাছা পরিষ্কার, রান্ধুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ দূরীকরণ, পাড় মেরামত, চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ, পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা এবং পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা।

খ) পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা : পোনার প্রজাতি নির্বাচন, ভালো পোনা বাছাইকরণ, পোনা শোধন, পোনার পরিমাণ নির্ধারণ, পোনা পরিবহন এবং পোনা অভ্যস্তকরণ ও ছাড়া।

গ) পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা : নিয়মিত সার প্রয়োগ, সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ, মাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাছ ধরা ও বিক্রয়।

### খামার পরিচালনার বিভিন্ন উপকরণ

খামার পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন। খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ভিত্তিক উপকরণসমূহের চাহিদা নিচে দেওয়া হলো :

ব্যবস্থাপনার পর্যায়	উপকরণের চাহিদা
মজুদ পূর্ব বা পুকুর প্রস্তুতি	দা, কোদাল, মাছ মারার বিষ (যেমন-রোটেনন), চুন, সার (জৈব ও অজৈব), বালতি, ড্রাম, মাটির চাড়ি, মগ, সেক্কিডিল্ল
মজুদকালীন	মাছের রেণু, হাড়ি বা পলিথিন ব্যাগ, খাবার লবণ, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, $P^H$ কাগজ, থার্মোমিটার
মজুদ পরবর্তী	জৈব ও অজৈব সার, মাটির চাড়ি, বাঁশের টুকরা, সেক্কিডিল্ল, সম্পূরক খাদ্য, বালতি, মগ/বাটি, খাদ্যদানি, চুন/জিপসাম, দা/কাঁচি, ব্যালেন্স, পাহারা দেওয়ার জন্য টর্চ, জাল (ধর্ম জাল, বাঁকি জাল, বেড় জাল)

### মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

মাছ চাষকালীন সময়ে রোগাক্রান্ত হতে পারে। তাই মাসে একবার জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাত্ক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। মাছের রোগের সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে মাছের স্বাভাবিক চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়, ফুলকার স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায়, দেহের উপর লাল/কালো/সাদা দাগ পড়ে, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় বা কম খায়, মাছের দেহ অতিরিক্ত খসখসে অনুভূত হয়। চাষকালীন মাছের কয়েকটি সাধারণ রোগ হচ্ছে ক্ষতরোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ, লাল ফুটকি রোগ, ফুলকা পচা রোগ এবং মাছের উকুন। খামারের পুকুরে মাছ রোগাক্রান্ত হলে মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাথমিকভাবে পুকুরের অবস্থাভেদে শতক প্রতি ০.৫-১.০ কেজি চুন প্রয়োগ করা যায়।

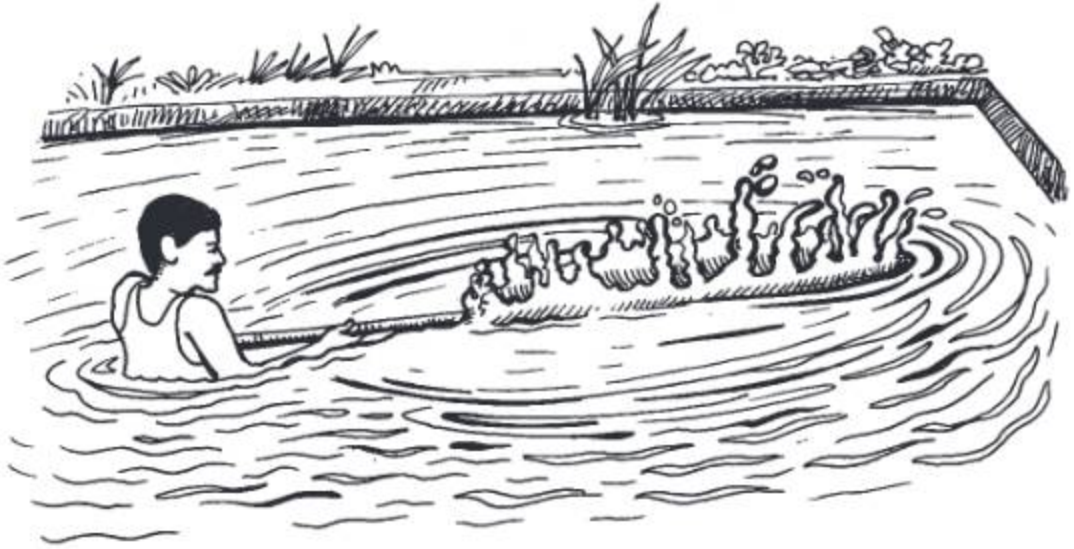
### পুকুরের কিছু সাধারণ সমস্যা ও প্রতিকার

#### ১। মাছ ভেসে ওঠা ও খাবি খাওয়া (পানিতে অক্সিজেনের অভাব)

পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদার উপস্থিতি, জৈব পদার্থের পচন, বেশি সার প্রয়োগ, ঘোলাত্ব, মেঘলা আবহাওয়া ও তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পানিতে অক্সিজেনের অভাব হয় এবং এ সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে মাছ ও চিংড়ি মারা যায়। অক্সিজেনের অভাবে মৃত মাছের মুখ 'হা' করা থাকে।

**প্রতিকার ব্যবস্থা :** পানিতে সাঁতার কেটে বা পানির উপর বাঁশ পিটিয়ে পুকুরের পানি আন্দোলিত করে অথবা হররা টেনে পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়াতে হবে। বিপদজনক অবস্থায় পুকুর পরিষ্কার করে নতুন পানি সরবরাহ করতে হবে অথবা পাম্প দিয়ে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।





চিত্র : বাঁশ পিটিয়ে পুকুরের পানিতে অক্সিজেন মেশানো

## ২। পানির উপর সবুজ স্তর

অতিরিক্ত সবুজ শেওলা উৎপাদনের ফলে এ সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে মাছের শ্বাস কষ্ট হয় ও মাছ পানির উপর খাবি খেতে থাকে। শেওলা পচে পরিবেশ নষ্ট হয়। মাছ ও চিংড়ির মৃত্যু হয়।

**প্রতিকার ব্যবস্থা :** পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে তুলে ফেলা যায়। সার ও খাদ্য দেওয়া সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে কিছু পানি পরিবর্তন করতে হবে। কিছু বড় সিলভার কার্প ছেড়ে জৈবিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

## ৩। পানির উপর লাল স্তর

লাল শেওলা অথবা অতিরিক্ত আয়রনের জন্য এ সমস্যা দেখা যায়। এর প্রভাবে পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। মাছ ও চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কমে যায়। আবার পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতিও হয়।

**প্রতিকার ব্যবস্থা :** শতাংশ প্রতি ১২-১৫ গ্রাম কপার সালফেট বা তুঁতে ছোট ছোট পোটলায় বেঁধে পানির উপর থেকে ১০-১৫ সেমি নিচে বাঁশের খুটিতে বেঁধে রাখলে বাতাসে ও পানিতে ঢেউয়ের ফলে তুঁতে পানিতে মিশে শেওলা দমন করে। খড়ের বিচালি বা কলাগাছের পাতা পেঁচিয়ে পানির উপর টেনে বা পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে তুলে ফেলা যায়।

## ৪। ঘোলা পানি

বৃষ্টি ধোয়া পানি পুকুরে প্রবেশের ফলে পানি ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। পাড়ে ঘাস না থাকলেও এমনটি দেখা যায়। এর ফলে পানিতে সূর্যের আলো ঢুকে না, ফুলকা নষ্ট হয়ে যায় ও প্রাকৃতিক খাদ্য কমে যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা : পুকুরে চুন (১-২ কেজি/শতক), জিপসাম (১-২ কেজি/শতক) বা ফিটকারী (২৪০-২৪৫ গ্রাম/শতক) প্রয়োগ করা যায়।

৫। পুকুরের তলদেশের কাদায় গ্যাস জমা হওয়া

পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদার উপস্থিতি এবং বেশি পরিমাণ লতাপাতা ও আবর্জনার পচনের ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে করে পানি বিষাক্ত হয়ে মাছ মারা যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা : পুকুর শুকনো হলে অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে। হররা টেনে তলার গ্যাস দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।



চিত্র : হররা

পারিবারিক মৎস্য খামার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবারের মাছের চাহিদা মেটানো এবং সেই সাথে সম্ভব হলে বাড়তি কিছু মাছ বাজারে বিক্রি করে পরিবারের সচ্ছলতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও পারিবারিক খামারের মাধ্যমে পরিবারের বেকার সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

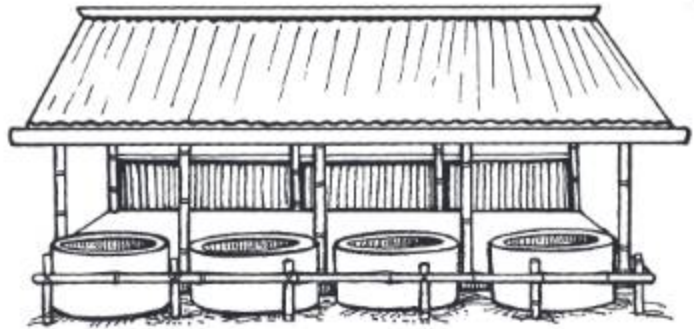
নতুন শব্দ : ক্ষুদ্র আয়, হররা

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### পারিবারিক দুগ্ধ খামার

গাভী পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। একজন মানুষের বছরে প্রায় ৯০ লিটার দুধ পান করা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশের একজন মানুষ বছরে গড়ে প্রায় ১০ লিটার দুধ পান করে থাকে। তাই দেশে দুধের উৎপাদন ও চাহিদার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। বিদেশ থেকে গুঁড়া দুধ আমদানি করে এই ঘাটতি আংশিক পূরণ করা হয়। দেশে দুধের ঘাটতি থাকায় বিগত দুই দশকে মানুষের মধ্যে গাভী পালন ও দুগ্ধখামার স্থাপনে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে গ্রাম থেকে শহর ও উপশহরে অনেকেই পারিবারিকভাবে গাভী পালন করছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাভী পালনে গাভীর বাসস্থান ও খাদ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। গাভী পালন করে স্বকর্মসংস্থান বাড়ানো যায়, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের আয় বাড়ানো যায় এবং পরিবারের পুষ্টি ও বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। সুতরাং আমরা নিজের বাড়িতে পারিবারিক খামার করে ২-৫টি গাভী পালনের মাধ্যমে আয়ের পথ সুগম করে দুধের চাহিদা মেটাতে পারি। উন্নত জাতের গাভীর খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করতে হবে। পারিবারিক পর্যায়ে ২-৫টি গাভী সমন্বয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার স্থাপন করা যায়। সাধারণত ৫টি বা তদুর্ধ্ব গাভী সমন্বয়ে বাণিজ্যিক খামার স্থাপন করা যায়। ঋণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করলে ব্যাংক ঋণ পরিশোধের খতিয়ান বিবেচনা করে খামার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। খামারের জন্য গাভী নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে উন্নত জাতের অধিক দুগ্ধসম্পন্ন হয়। পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য বসতবাড়ির উঁচু স্থান নির্বাচন করতে হবে। খামারের স্থান নির্বাচনে যেসব বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে, সেগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- অপেক্ষাকৃত উঁচু ও শুষ্ক ভূমি
- খামারের ভূমি উন্নয়ন ও নির্মাণ
- খামার সম্প্রসারণ করার সুযোগ
- বসতঘর হতে একটু দূরে
- ভালো যোগাযোগব্যবস্থা
- পানি ও পশু খাদ্যের প্রাপ্যতা
- পণ্যের চাহিদা ও বাজার ব্যবস্থা বিবেচনা



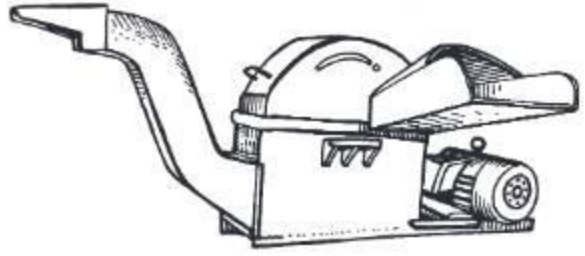
চিত্র : একটি পারিবারিক গোশালা

#### পারিবারিক দুগ্ধ খামারের প্রয়োজনীয় উপকরণ

পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপন করতে বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। খামার নির্মাণের জন্য মূলধন থেকে শুরু করে গাভীর বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। উপকরণ নির্বাচন ও ক্রয়ের সময় গুণগতমান সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে। নিম্নে উপকরণসমূহের পরিচিতি দেওয়া হলো :



মূলধন, খামারের ভূমি বা জমি, ভালো জাতের গাভী, আদর্শ গোশালা, গোশালা নির্মাণসামগ্রী, উন্নত খাদ্যের ও পানির পাত্র, ঘাসের জমি, পানির লাইন, পরিবহনের জন্য পিক আপ/মটরভ্যান বা রিকসা ভ্যান, ঘাস কাটার চপিং মেশিন, ফিড ট্রলি ও খামারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, দুগ্ধ দোহন ও বিতরণ সামগ্রী, পশুর প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি, পশুর জন্য প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্য, টিকার সরবরাহ এবং পশুকে কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা।



চিত্র : ঘাস চপিং মেশিন

কাজ : পারিবারিক দুগ্ধ খামারের উপকরণের তালিকা তৈরি করবে।

### দুগ্ধ দোহন

গাভীর ওলান থেকে দুধ সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে দুধ দোহন বলে। নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে একই গোয়ালার দ্বারা গাভী থেকে দুধ দোহন করতে হয়। এতে করে গাভী স্থিরতাবোধ করে এবং উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

### দুধ দোহনের ধাপ-

- ১। দুধ দোহনের সময় : প্রতিদিন দুইবার অথবা তিনবার দুধ দোহন করা যায়। নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে দোহন করলে দুধ উৎপাদন বাড়ে।
- ২। গাভী প্রস্তুত করা : দুধ দোহনের পূর্বে কখনোই গাভীকে উত্তেজিত বা বিরক্ত করা যাবে না। কোনো অবস্থাতেই গাভীকে মারধর করা যাবে না। দুধ দোহনের পূর্বে গাভীর ওলান ও বাঁট কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর পরিষ্কার কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে ওলান ও বাঁট মুছে নিতে হবে।
- ৩। গোয়ালার প্রস্তুতি : দোহনের পূর্বে গোয়ালাকে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হবে। গামছা বা কোনো কাপড় দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে হবে। দোহনকারীর নখ কেটে নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। দুধ দোহনের সময় দোহনকারীর বদভ্যাস যেমন- থুথু ফেলা, নাক ঝাড়া এমনকি কথা বলা ইত্যাদি ত্যাগ করতে হবে।
- ৪। দোহনের জন্য পরিষ্কার পাত্র ব্যবহার করা : ওলান থেকে দুধ দোহনের সময় বালতির পরিবর্তে গম্বুজ আকৃতির ঢাকনাসহ স্বাস্থ্যসম্মত হাতাওয়ালা বালতি ব্যবহার করা উচিত। দুধ দোহনের পর দুধের পাত্র প্রথমে গরম পানি দিয়ে এবং পরে ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। পরবর্তী দোহনের পূর্ব পর্যন্ত তাকে পাত্রগুলো উপুড় করে রাখতে হবে।

৫। গাভীকে মশামাছি মুক্ত রাখা : দুধ দোহনের সময় মশা মাছি যেন গাভীকে বিরক্ত না করে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬। দুধ দোহনের জন্য গাভীকে উদ্দীপিত করা : বাছুরের দ্বারা গাভীর বাঁট চুষিয়ে অথবা গোয়ালী কর্তৃক ওলান ম্যাসাজ করে গাভীকে দুধ দোহনের জন্য উদ্দীপিত করতে হবে।

৭। দোহনের সময় গাভীকে খাওয়ানো : দুধ দোহনের সময় গাভীকে ব্যস্ত রাখার জন্য অল্প পরিমাণ দানাদার খাদ্য বা সবুজ ঘাস গাভীর সামনে দেওয়া উচিত। এতে গাভী খাবার খেতে ব্যস্ত থাকে এবং দুধ দোহন সহজ হয়।

দুধ দোহন পদ্ধতি : দুধ দোহন পদ্ধতি দুই প্রকার -

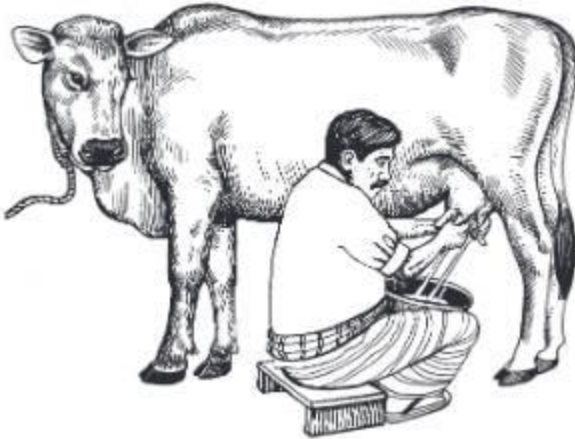
১। সনাতন পদ্ধতি : হাত দ্বারা দোহন

২। আধুনিক পদ্ধতি : যন্ত্রের সাহায্যে দোহন

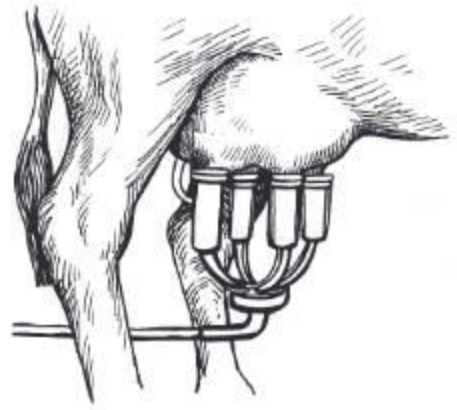
দুধ দোহনের সময় যে কোনো একটি পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১। হাত দিয়ে দুধ দোহন

দোহনের সময় ওলানের বাঁটের গোড়া বন্ধ রেখে বাঁটের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হয়। ফলে বাঁটের মধ্যে জমা হওয়া দুধ বের হয়ে আসে। আবার চাপ সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে ওলান থেকে বাঁটে দুধ এসে জমা হয়। এভাবেই প্রক্রিয়াটি বারবার চলতে থাকে। হাত দিয়ে দোহনের সময় গাভীর বামপাশ থেকে দোহন করতে হয়। দুধ দোহনের সময় প্রথমে সামনের দুই বাঁট একসাথে ও পরে পিছনের দুই বাঁট একসাথে দোহন করা হয়। আবার অনেকে গুণ (X) চিহ্নের মতো সামনের একটি ও পিছনের একটি বাঁট একসাথে অথবা যে বাঁটে দুধ বেশি আছে বলে মনে হয়, সেগুলো আগে দোহন করে থাকে।



চিত্র : সনাতন পদ্ধতি



চিত্র : আধুনিক পদ্ধতি

## ২। যজ্ঞের সাহায্যে দোহন

বড় বড় বাণিজ্যিক খামারে যেখানে গাভীর সংখ্যা অনেক বেশি, সেখানে একসঙ্গে অনেকগুলো গাভীকে দোহনের জন্য দোহন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। দোহনের সময় হলে গাভীর বাঁটে টিট কাপ লাগিয়ে দুধ দোহন যন্ত্র চালু করা হয়। এতে সহজে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন করা সম্ভব হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দুধ দোহনের আধুনিক ও সনাতন পদ্ধতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করবে।

## দুধ সংরক্ষণ

নির্দিষ্ট সময়-সীমা পর্যন্ত দুধকে খাদ্য হিসাবে উপযোগী রাখতে পচনমুক্ত রাখার প্রক্রিয়াকে দুধ সংরক্ষণ বলে। দোহনের পর পরই দুধকে ছাঁকতে ও ঠাণ্ডা করতে হয়। দুধের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন সহজ নয়। কারণ দুধের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন খুব সহজে ঘটে। বাংলাদেশের সর্বত্রই সাধারণত কাঁচা দুধ বিক্রি করা হয়। দুধ অধিক সময় কাঁচা অবস্থায় থাকলে গুণগত মান ক্ষুণ্ণ হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় বিভিন্ন জীবাণু দুধে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্নের মাধ্যমে দুধকে টক স্বাদযুক্ত করে ফেলে। স্ট্রেপটোকক্কাই (Streptococci) নামক জীবাণু প্রধানত দুধে এসিড তৈরি করে। জীবাণু সাধারণ তাপমাত্রায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে দুধ নষ্ট করে ফেলে। নিম্নে দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

### ক) দুধ সংরক্ষণের সনাতন পদ্ধতি

দুধ তাপ দ্বারা ফুটিয়ে সংরক্ষণ করা : পারিবারিকভাবে এটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। একবার গরম করলে ৪ ঘণ্টা ভালো থাকে। তাই ৪ ঘণ্টা পর পর ২০ মিনিট করে ফুটালে প্রায় সব রকম রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তবে, এতেও দুধের পুষ্টিমান কিছুটা কমে যায়। কেননা উচ্চ তাপ প্রক্রিয়ায় কিছুসংখ্যক ভিটামিন ও অ্যামাইনো এসিড নষ্ট হয়ে যায়।

### খ) দুধ সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি

- ১। রিফ্রিজারেটরে অল্প সময়ের জন্য ৪° সে. রেখে দুধ সংরক্ষণ করা যায়।
- ২। ডিপ ফ্রিজে দুধ সংরক্ষণ করা যায়। এখানে দুধে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় না ঠিক, তবে দুধের রাসায়নিক বদল ভেঙে যায়। ফলে দুধের গুণগত মান কিছুটা হ্রাস পায়।

### ৩। দুধ পাস্টুরিকরণ

পৃথিবীতে দুধকে অন্যতম আদর্শ খাদ্য বলা হয়। এই দুধ বাছুর বা মানুষের জন্য আদর্শ খাবার, সাথে সাথে এটি অণুজীবের জন্যও সমানভাবে আদর্শ মাধ্যম। দুধ দোহনের পর সময়ের সাথে সাথে দুধের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে এবং দীর্ঘক্ষণ সাধারণ তাপমাত্রায় রাখলে একসময় সম্পূর্ণরূপে এটি নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট হওয়ার কারণ হিসাবে প্রধানত অণুজীবকে দায়ী করা হয়। এই অণুজীব অতি উচ্চ তাপমাত্রায় ও নিম্ন তাপমাত্রায় জন্মাতে ও বংশ বিস্তার করতে পারে না। এই তাপমাত্রা ব্যবহার করে দুধের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করার উপায় হলো পাস্টুরিকরণ। দুধ পাস্টুরিকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো রোগ উৎপাদনকারী



জীবাণু ধ্বংস করা। দুধ বেশি সময় সংরক্ষণের জন্য অবাস্তিত জীবাণু ধ্বংস করা, দুধে উপস্থিত এনজাইম নিষ্ক্রিয়করণ।

লুই পাস্তুর (১৮৬০-১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) একজন ফরাসি রসায়নবিদ প্রথম অনুধাবন করেন যে, পচনপ্রণালি এক প্রকারের জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। যদিও লুই পাস্তুরই পাস্তুরিকরণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক, কিন্তু দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণে ড. সথস লট নামক এক জার্মান বিজ্ঞানী প্রথম এর ব্যবহার করেন। দুধে উপস্থিত রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ও এনজাইম ধ্বংস কল্পে দুধের প্রত্যেক কণাতে ১৪৫° ফা. (৬২.৮° সে.) তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট সময়কাল অথবা ১৬২° ফা. (৭২.২° সে.) তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড সময়কাল পর্যন্ত উত্তপ্ত করাকে পাস্তুরিকরণ বলে। পাস্তুরিকৃত দুধ সঙ্গে সঙ্গে ৪° সে. তাপমাত্রার নিচে ঠাণ্ডা করতে হবে।

#### পাস্তুরিকরণের সুবিধা

- ১। পাস্তুরিকৃত দুধ নিরাপদ। কেননা এতে রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ধ্বংস হয়।
- ২। পাস্তুরিকরণ দুধের সংরক্ষণকাল দীর্ঘায়িত করে। কেননা ইহা ল্যাকটিক এসিড প্রস্তুতকারী জীবাণুর সংখ্যা কমায়।
- ৩। পাস্তুরিকরণ এর ফলে দুধের এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে দুধ দীর্ঘক্ষণ ভালো থাকে।
- ৪। পাস্তুরিকরণের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষতিকর জীবাণু বিনষ্ট হয়ে যায়।
- ৫। এই প্রক্রিয়ায় দুধের পুষ্টিমান ঠিক থাকে, কোনো বিস্বাদের সৃষ্টি হয় না।

#### পাস্তুরিকরণের অসুবিধা

- ১। পাস্তুরিকরণ প্রক্রিয়া আদর্শ উপায়ে করতে না পারলে অতিরিক্ত আলোচ্ছলে দুধের চর্বি কণা পৃথক হতে পারে।
- ২। তাপ সংবেদনশীল ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- ৩। উচ্চ তাপজনিত কিছুটা বিস্বাদের সৃষ্টি করতে পারে।

#### পাস্তুরিকরণের প্রকারভেদ

- ১। নিম্ন তাপ দীর্ঘ সময় পাস্তুরিকরণ ৬২.৮° সে. তাপ ৩০ মিনিট সময়ের জন্য।
- ২। উচ্চ তাপ কম সময় পাস্তুরিকরণ ৭২.২° সে. তাপ ১৫ সেকেন্ড সময়ের জন্য।
- ৩। অতি উচ্চ তাপে পাস্তুরিকরণ ১৩৭.৮° সে. তাপে ২ সেকেন্ড সময়ের জন্য।

নতুন শব্দ : দুধ দোহন, পাস্তুরিকরণ

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করা

পারিবারিক খামার একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এইরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো পারিবারিক কৃষি খামারের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ সম্পত্তির বিবরণ, ব্যয় বা বিনিয়োগের যাবতীয় তথ্য, আয়ের সকল তথ্য এবং মুনাফার তথ্য লিপিবদ্ধ বা নথিবদ্ধ করা প্রয়োজন। নিচে একটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো :

পারিবারিক খামার : আলিফ পারিবারিক খামার

মালিকের নাম : আলিফ মিঞা

ঠিকানা : গ্রাম- বয়রা

মৌজা -বয়রা-ভালুকা

উপজেলা/থানা- ময়মনসিংহ সদর

ডাকঘর- ময়মনসিংহ ২২০২

পারিবারিক খামারে মোট জমির পরিমাণ : ১ বিঘা (৩৩ শতক)।

উঁচু জমি	: ৩ শতক
মাঝারি নিচু জমি	: ১০ শতক
পুকুর	: ২০ শতক
খামার	: ৩ টি
মৎস্য খামার	: ২০ শতক
সবজি খামার	: ১০ শতক
ব্রয়লার মুরগির খামার	: ৩ শতক

নিম্নে ব্রয়লার মুরগির খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব বর্ণনা করা হলো।

### খামারের উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

পারিবারিকভাবে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগি পালন করলে নিজেদের খাবার মাংস ও ডিমের চাহিদা মেটে। তাছাড়া ব্রয়লার ও খাবার ডিম বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় করা সম্ভব। নিচে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের আয়-ব্যয় হিসাব করার একটি নমুনা দেওয়া হলো।

ব্রয়লার মুরগি পালনের ব্যয়ের খাত ২টি- ক। স্থায়ী খরচ খ। চলমান খরচ

ক। স্থায়ী খরচ (Capital or Fixed Expenditure) : খামারে বাচ্চা তোলায় আগে জমি, মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, ব্রুডার যন্ত্র, খাদ্যের পাত্র, পানির পাত্র, ড্রাম ও বাঁলতি ইত্যাদি খাতসমূহে যে সমস্ত খরচ হয়, তাকে মূলধন বা স্থায়ী খরচ বলে। নিচে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের ব্যয় হিসাব করার একটি ছক দেওয়া হলো।

জমি	মুরগির ঘর তৈরি	কুড়ার যন্ত্র (হোভার, চিক গার্ড, বাস্ক)	খাদ্যের ও পানির পাত্র	পানির বালতি ও ড্রাম	মোট স্থায়ী খরচ
নিজ	৮,০০০/-	২,০০০/-	১,০০০/-	১,০০০/-	১২,০০০/-

খ. চলমান খরচ (Recurring Expenditure) : খামারে বাচ্চা জন্ম থেকে শুরু করে দৈনন্দিন যে সব খরচ হয় তাকে চলমান খরচ বলে। বাচ্চা পালনকালে শেষ পর্যন্ত ১০০টির মধ্যে ২-৫টির মৃত্যু হয়। চলমান খরচের মধ্যে বাচ্চার দাম, খাদ্য ক্রয়, চলতি বিদ্যুৎ খরচ, টিকা ও ঔষধ, লিটার (মুরগির বিছানা), শ্রমিক ও পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্য। ব্রয়লার মুরগি মোট ১ মাস খামারে থাকে। নিচে পারিবারিক খামারে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের চলমান খরচ হিসাব করার একটি ছক উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হলো।

বাচ্চার দাম (প্রতিটি ৫০/-)	খাদ্য ক্রয় (প্রতিটির জন্য ৩ কেজি করে মোট ৩০০ কেজি খাদ্য, প্রতি কেজি ৩৩/-)	বিদ্যুৎ খরচ	টিকা ও ঔষধ	লিটার	শ্রমিক	পরিবহন খরচ	মোট চলমান খরচ
৫,০০০/-	৯,৯০০/-	৩০০/-	১৫০০/-	২০০/-	নিজ	৫০০/-	১৭,৮০০/-

কাজ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে ১৬০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখে ক্লাসে জমা দেবে।

প্রকৃত ব্যয় হিসাবের জন্য মোট চলমান খরচের সাথে মুরগির ঘর, যন্ত্রপাতি, মূলধন ও চলমান খরচের উপর অপচয় খরচ (Depreciation Cost) হিসাব করতে হবে।

মোট বাৎসরিক অপচয় খরচ (Depreciation Cost)

১। মুরগির ঘরের উপর (৮,০০০/- টাকার উপর ৫%) = ৪০০/-

২। যন্ত্রপাতির উপর (৮,০০০/-টাকার উপর ১০%) = ৮০০/-

৩। মোট স্থায়ী মূলধন ও মোট চলমান খরচ = (১২,০০০+ ১৭,৮০০/-) উপর ১৫% = ৪,৮১০/-

মোট বাৎসরিক অপচয় খরচ = ৫,২১০/- টাকা

এক বছরে যদি ১০টি ব্যাচ পালন করা যায় তবে একটি ব্যাচের মোট অপচয় খরচ হবে = টা. ৫২১/- টাকা

অতএব মোট ব্যয় = মোট চলমান খরচ + একটি ব্যাচের মোট অপচয় খরচ = টা. ১৭,৮০০/- +টা. ৫২১/- টাকা  
= টা. ১৭,৯২১/-

আয় (Income) : ব্রয়লার মুরগি, লিটার ও খাদ্যের বস্তা বিক্রি করে আয় করা যায়। তাছাড়া লিটার জৈব সার হিসেবে জমিতে এবং মাছের খাদ্য তৈরিতে পুকুরে ব্যবহার করা যায়। নিচে পারিবারিক খামারে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি থেকে আয় হিসাব করার একটি ছক উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হলো।



ব্রয়লার মুরগি বিক্রি ৯৫টি (৫% মৃত্যু) ১৫০/- কেজি (গড় ওজন ১.৪ কেজি)	লিটার বিক্রি	খাদ্যের বস্তা বিক্রি (বস্তা ৬টি, প্রতিটি ১০/-)	মোট আয়
১৯,৯৫০/-	১০০/-	৬০/-	২০,১১০/-

নিট লাভ = (মোট আয় - মোট ব্যয়) = টা. ২০,১১০/- - টা. ১৭,৯২১/- = টা. ২,১৮৯/- টাকা

কাজ : শিক্ষার্থীরা খামারের আয় ব্যয়ের ও লাভ ক্ষতির হিসাব নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখবে।

নতুন শব্দ: স্থায়ী খরচ, চলমান খরচ, লিটার

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পারিবারিক মিনি পুকুরে চাষ করা হয় কোন মাছ?

ক. মৃগেল

খ. গ্রাস কার্প

গ. সরপুটি

ঘ. পাক্দাশ

২. দুধ পাস্তুরিকরণের উদ্দেশ্য -

i. জীবাণু ধ্বংস করা।

ii. গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ রাখা।

iii. রাসায়নিক উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

### নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মিলন মিয়া তার বাড়ির সামনের ৬০ শতকের ১.৫ মিটার গভীরতার পুকুরে মাছের চাষ করেন। বর্ষার শেষে তিনি পুকুরে গিয়ে লক্ষ করেন তার পুকুরের মাছগুলো ঘাটে পুতে রাখা বাঁশের সাথে গা ঘষছে। তিনি এ বিষয়ে মৎস্য কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করলে মৎস্য কর্মকর্তা তাকে কিছু পরামর্শ দেন।

৩. মিলন মিয়ার পুকুরের মাছগুলো কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল?

ক. ক্ষত রোগ

খ. লেজ পচা রোগ

গ. মাছের উকুন রোগ

ঘ. লাল ফুটকি রোগ

৪. মিলন মিয়ার পুকুরের জন্য কমপক্ষে কত কেজি ডিপটারেক্স প্রয়োজন?

ক. ১.৫ কেজি

খ. ১.৮ কেজি

গ. ২.৫ কেজি

ঘ. ২.৮ কেজি

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফ ও হাসিফদীর্ঘ দিন ধরে নিজ আঙিনায় দেশি জাতের মুরগি পালন করে আসছেন। এতে তেমন লাভবান না হওয়ায় তাঁরা পোল্ট্রি খামারের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে পারিবারিক পোল্ট্রি খামার স্থাপন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সফলতা লাভ করেন। কিন্তু তারা লক্ষ করলেন তাদের খামারের বর্জ্যগুলো বাড়ির পরিবেশকে দূষিত করছে। এ অবস্থায় তারা খামারের বর্জ্যগুলো পচিয়ে ফসলের জমিতে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. পারিবারিক খামার কাকে বলে?

খ. বাণিজ্যিক খামারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

গ. আরিফ ও হাসিফের সফলতার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আরিফ ও হাসিফের উদ্যোগটির বৈজ্ঞানিকতা বিশ্লেষণ করো।

# ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : কৃষিশিক্ষা

পরিশ্রম কখনও নিষ্ফল হয় না।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।